আল-ফিক্‌হুল হানাফী

মাসাইল ও ফাতাওয়া সমগ্র

[তাহারাত ও সালাত]

ড. মুহাম্মাদ হিফযুর রহমান
অধ্যক্ষ
হাজীগঞ্জ দারুল উলুম আহমাদিয়া কামিল মাদরাসা
হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর

সবুজপত্র

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য নিবেদিত, যিনি আমাদের প্রতি আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ ও কুরআন মাজীদ নাযিল করে একটি পূর্ণাঙ্গ শরী'আত প্রদান করেছেন। দরূদ ও সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর আহলে বাইত ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি, যাঁরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিটি মুহূর্তে এ শরী'আতকে বাস্তবায়নের পূর্ণ চেষ্টা করেছিলেন এবং এরই মাধ্যমে ধূলির ধরায় এনেছিলেন অনাবিল শান্তি ও শাশ্বত মুক্তি।

এ শান্তি ও মুক্তিলাভের পথ কুরআন ও হাদীসে বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। অনন্তর সে অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ তাঁদের জীবন পরিচালনা করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের সময় থেকেই নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয় এবং এমন শরয়ী মাসাইলের প্রয়োজন দেখা দেয়, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে প্রয়োজন পড়েনি। এভাবে শরয়ী মাসাইলের পরিধি বাড়তে লাগল এবং মানুষ নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হলো। আর আল্লাহ তাআলা সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দক্ষ এমন কিছু জ্ঞানবান বান্দার আবির্ভাব ঘটালেন, যাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ঐসব সমস্যার সমাধানে সক্ষম ও পারদর্শী ছিলেন। যাঁরা মুজতাহিদ ও ফকীহ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন ফকীহ ফাতাওয়া প্রদান করলেও মাত্র চারটি মাযহাব প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং দুনিয়ার সর্বত্র প্রচারিত হয়। হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী। চারটি মাযহাবের মধ্যে হানাফী মাযহাব সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করে। বিশেষতঃ আব্বাসীয় খেলাফত আমলে ইমাম আবূ ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ রাষ্ট্রীয় প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার পর মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র এবং সর্বক্ষেত্রে হানাফী ফিক্‌হের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান শায়বানী, যুফার, হাসান ইবনে যিয়াদ প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ ইমামগণ হানাফী উসূলের ভিত্তিতে মাসআলা পর্যালোচনা করে হানাফী মাযহাবকে আরও গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী করে তোলেন।

মুতাকাদ্দিমীন আলিমগণের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফাতাওয়ার চাহিদা মেটাতে এবং সাধারণ লোকদেরকে মাসআলা অবগত করাতে প্রত্যেক যুগেই যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ও ফকীহগণ ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক উদ্যোগে ফাতাওয়া প্রদান এবং তা কিতাব আকারে প্রকাশ করতে থাকেন। এসব কিতাবে কেবল সমাধান দেয়া হতো; কোনো প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করা হতো না এবং এসব উত্তর ও সমাধানগুলোর সমর্থনে কী দলীল-প্রমাণ রয়েছে তাও উল্লেখ করার রীতি ছিলো না। মুতাকাদ্দিমীন আলিমগণের যুগ থেকেই হানাফী ফিক্‌হ ব্যাপক চর্চিত ও ব্যবহৃত হতে থাকায় সে যুগ থেকেই প্রচুর নির্ভরযোগ্য ফিক্‌হের কিতাব ও ফাতাওয়াগ্রন্থ রচিত হতে থাকে, যার প্রায় সবক'টিই আরবী ভাষায় প্রণীত হয়েছে। তখন রাষ্ট্রভাষা আরবী ছিল বিধায় এ ভাষাতেই সকল কাজ সম্পন্ন করা হত। পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় ফাতাওয়া প্রদান ও কিতাব রচনা আরম্ভ হয়। আধুনিককালে প্রায় সকল ভাষাতেই ফিক্‌হের কিতাবাদি রচিত ও অনূদিত হয়েছে। বিশেষতঃ আধুনিক সমস্যার সমাধান দিতে আরবীর পাশাপাশি উর্দু এবং ফারসি ভাষায়ও বহু ফাতাওয়াগ্রন্থ প্রণীত হয়েছে।

কিন্তু বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য বাংলায় শরয়ী মাসাইলের বৃহৎ আকারে কোনো গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। বহুদিন ধরে আমি এমন একটা কিতাব সংকলনের ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম, যাতে যথাসম্ভব সকল মাসাআলা সন্নিবেশিত হয় এবং মাসআলা অন্বেষণকারীর জন্য বহু গ্রন্থ অনুসন্ধানের প্রয়োজন না পড়ে। কিন্তু নিজের জ্ঞানের স্বল্পতা, যোগ্যতার দীনতা, সর্বোপরি "পাছে লোকে কিছু বলে" এসব ভাবনার কারণে লেখার কাজ শুরু করতে পারিনি। কিন্তু আমার কিছু শুভাকাঙ্ক্ষীর উৎসাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, "সৎ কাজের পথপ্রদর্শনকারী সৎকর্ম সম্পাদনকারীর ন্যায়"-এর দিকে দৃষ্টিপাত করে নিজের স্বল্প পুঁজি নিয়েই এগুতে শুরু করি।

এজন্য আমি আধুনিক ও প্রাচীন দুর্লভ বহু নির্ভরযোগ্য ফিক্‌হ ও ফাতাওয়ার কিতাব পর্যালোচনা করে ধীরে-সুস্থে বক্ষ্যমাণ কিতাবটি লিখতে আরম্ভ করি। এমনকি বিভিন্ন মাসআলার সমাধানে ও কিতাবাদির জটিল ভাষ্যের অনুবাদে সমকালীন যুগশ্রেষ্ঠ ওলামায়ে দীনের পূর্ণ সহায়তা নিয়েছি। বিশেষ করে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফতী ও মুহাদ্দিস সাইয়েদ আমীমুল এহসান আল মুজাদ্দেদী আল বারাকাতীর স্নেহধন্য ছাত্র ও আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মুফতী মাওলানা শাহজালাল শরীফ ইবরাহীমী রাহিমাহুল্লাহ এবং আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী জামেয়া এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জের প্রাক্তন শিক্ষক মাওলানা মুফতী নূর মুহাম্মদ চাটগামী এক্ষেত্রে আমাকে সহায়তা ও সঠিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

তাছাড়া সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও দেশবরেণ্য আলিমে দীন আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব আমার পিতা বিজ্ঞ মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মাদ আবিদুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ও আমার শ্রদ্ধাভাজন শ্বশুর হাফেয কারী মাওলানা মাহমুদুল হাসান মাদানী (মাদ্দা যিল্লুহুল আলী) আমাকে প্রয়োজনীয় সহায়ক গ্রন্থ প্রদান করে এ কিতাবখানি সম্পাদনার ক্ষেত্রে অফুরন্ত উপকার করেছেন। এ কিতাব রচনা ও সংকলনের ক্ষেত্রে আমি ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর বর্ণনা ও বিন্যাস পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। কারণ, প্রচলিত ফাতাওয়া গ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থখানির বর্ণনা ও বিন্যাস পদ্ধতি খুবই আকর্ষণীয়। তবে এর বিন্যাস পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ করিনি; বরং অনেক নতুন কিছু সংযোজন করেছি এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়াবলি বাদ দিয়েছি। যেহেতু, এ গ্রন্থে ফাতাওয়ার বহু কিতাব থেকে মাসআলা চয়ন করা হয়েছে তাই আমি এর নাম দিয়েছি 'মাসাইল ও ফাতাওয়া সমগ্র'। এতে প্রতিটি মাসআলা লিখার পর তা যে কিতাব থেকে সংকলন করা হয়েছে তার নাম, খণ্ড ও পৃষ্ঠা-নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে করে পাঠক সহজেই মাসআলার উৎস সম্পর্কে জানতে পারেন। আমার এ কিতাবখানি সাধারণ লোকদের জন্য লেখা, যারা ফিক্‌হ বিষয়ে পরিজ্ঞাত নন। বিশেষত আমি নিজে এর দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। কিন্তু যাঁরা ফকীহ ও মুফতী, আল্লাহ তাআলা যাঁদেরকে দীনের পূর্ণ জ্ঞান দান করেছেন তাঁদের কথা ভিন্ন। তাঁদের জন্য মূল আরবী কিতাব ও ফাতাওয়া গ্রন্থ এমনকি কুরআন-হাদীস ও ইমামদের উসূল ও ফিক্‌হের কিতাবাদিই যথেষ্ট।

ঐ সব বিজ্ঞ ফকীহ, মুফতী ও আলিমে দীনের খেদমতে আরজ, আমাদের এ কিতাবের মধ্যে কোনো রকম ভুল-ত্রুটি যদি আপনাদের কাছে ধরা পড়ে তাহলে "এক মুমিন অন্য মুমিনের আয়নাস্বরূপ" হিসেবে আমাকে সুনির্দিষ্টভাবে জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করতে সচেষ্ট হব, ইনশাআল্লাহ। আর আমাদের এ কিতাবের ভুল শুধরে দেয়া আপনাদের মতো অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের ঈমানী দায়িত্বও। নচেৎ মাসআলাগত ভুল সংশোধন না করে দেয়ার দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাদের জিজ্ঞাসিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সূচিপত্র

মুকাদ্দামা [ভূমিকা]

বিবরণ	পৃষ্ঠা
ফিক্হ ও ফকীহ	২৮
ফাতাওয়া কাকে বলে? মুফতী কে?	৩০
মুফতীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলি	৩৫
ফিক্হ ও ফাতাওয়ায় লেখকের সনদ	৩৮
হানাফী ফিক্হের পরিচয়	৪০
হানাফী মাসাইলের স্তর	৪৩
হানাফী ফকীহদের স্তর	৪৬
হানাফী ফিক্হের সনদ	৪৮
ইমাম আবূ হানীফা ও ফিক্হশাস্ত্রে তাঁর অবদান	৪৯
তাঁর হাদীস অধ্যয়ন	৫২
তাঁর ওস্তাদগণ	৫২
তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রবৃন্দ	৫৩
ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণ ও রাবী হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন	৫৪
কাবা শরীফে ইমাম আবূ হানীফার শিক্ষাদান	৫৮
তাঁর ব্যবহার, দানশীলতা ও প্রাত্যাহিক কর্মসূচি	৫৮
খোদাভীরুতা ও ইবাদত	৫৯
তাঁর উপর উমাইয়া শাসকদের অত্যাচার	৬০
তাঁর উপর আব্বাসীয়দের অত্যাচার	৬১
ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র শাহাদাত	৬২
ইমাম আবূ হানীফা তাবেয়ী ছিলেন কি না?	৬২
ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফার অবদান	৬৪
শরয়ী হুকুমসমূহের প্রকারভেদ	৬৮

প্রথম খণ্ডঃ কিতাবুত তাহারাত (পবিত্রতা পর্ব)

অধ্যায়-১. ওযূর বর্ণনা

পরিচ্ছেদ [১.১] ওযূর শর্ত	৭৪
পরিচ্ছেদ [১.২] ওযূর ফরযসমূহ	৭৬
পরিচ্ছেদ [১.৩] ওযূর সুন্নাতসমূহ	৮২

বিবরণ	পৃষ্ঠা
পরিচ্ছেদ [১.৪] ওযূর মুস্তাহাবসমূহ	৮৯
পরিচ্ছেদ [১.৫] ওযূর আদবসমূহ	৯০
পরিচ্ছেদ [১.৬] ওযূর মাকরূহসমূহ	৯৩
পরিচ্ছেদ [১.৭] ওযূর প্রকারভেদ	৯৪
পরিচ্ছেদ [১.৮] ওযূ ভঙ্গের কারণসমূহ	৯৫
পরিচ্ছেদ [১.৯] যেসব কারণে ওযূ ভঙ্গ হয় না	১০৯
পরিচ্ছেদ [১.১০] ওযূর মধ্যে সন্দেহের বিবরণ	১১১
পরিচ্ছেদ [১.১১] ওযূর পূর্ণাঙ্গ তারতীব	১১২
পরিচ্ছেদ [১.১২] মা'যূরের বর্ণনা	১১২
পরিচ্ছেদ [১.১৩] মা'যূরের কেটে যাওয়া অঙ্গ, ক্ষতস্থান ও ব্যান্ডেজের হুকুম	১১৭
পরিচ্ছেদ [১.১৪] বেওযূ অবস্থার হুকুমসমূহ	১১৮
পরিচ্ছেদ [১.১৫] ওযূ সংক্রান্ত বিবিধ মাসাইল	১২১

অধ্যায়-২. গোসলের বর্ণনা

পরিচ্ছেদ [২.১] গোসলের ফরযসমূহের বর্ণনা	১২৫
পরিচ্ছেদ [২.২] গোসলের সুন্নাতসমূহের বর্ণনা	১২৯
পরিচ্ছেদ [২.৩] গোসলের মুস্তাহাব ও আদবসমূহ	১৩০
পরিচ্ছেদ [২.৪] গোসলের পূর্ণাঙ্গ তারতীব	১৩১
পরিচ্ছেদ [২.৫] গোসল ফরয হওয়ার বর্ণনা	১৩২
পরিচ্ছেদ [২.৬] গোসলের প্রকারভেদ	১৩৯
পরিচ্ছেদ [২.৭] যে সকল অবস্থায় গোসল ফরয হয় না তার বিবরণ	১৪২
পরিচ্ছেদ [২.৮] বে-গোসল অবস্থার হুকুমসমূহ	১৪৩
নাপাক অবস্থায় বিনা ওযূতে মাসজিদে প্রবেশ ও অবস্থান	১৪৪
পরিচ্ছেদ [২.৯] গোসল সংক্রান্ত বিবিধ মাসাইল	১৪৫
গোসলের পর ওযূ করা প্রসঙ্গ	১৪৬
গোসলের বর্ণনা, গোসলখানায় যাওয়া ও বের হওয়ার সুন্নাহ পদ্ধতি এবং তাতে পেশাব করার প্রসঙ্গ	১৪৭
জানাবাত অবস্থায় শোয়া, বারবার সহবাস করা ও কাপড়ে বীর্য লেগে থাকার হুকুম বর্ণনা প্রসঙ্গ	১৪৯
খুনছায়ে মুশকিল ও হিজরা সংক্রান্ত মাসাইল	১৫০

অধ্যায়-৩. পানির বর্ণনা

পবিত্রতা অর্জনের দিক দিয়ে পানি পাঁচ প্রকার	১৫২
পরিচ্ছেদ [৩.১] যে পানি দ্বারা তাহারাত (পবিত্রতা অর্জন) জায়েয	১৫৩
প্রবহমান পানি	১৫৩

বিবরণ	পৃষ্ঠা
কবরের উপর দিয়ে চলা এবং বসা নিষেধ	৬৪২
সুন্নাত বিরোধী কাজসমূহ	৬৪২
কবর ধসে গেলে দ্বিতীয়বার মাটি দেয়া	৬৪২
মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করা	৬৪৩
মৃত ও তার উত্তরসূরীদের প্রতি সদ্ব্যবহার	৬৪৩
উত্তরসূরীদেরকে সান্ত্বনা প্রদান	৬৪৩
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত সান্ত্বনা নামা	৬৪৪
মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ছেলের মৃত্যুর পর	৬৪৪
মৃতের পরিবারের জন্য খানা পাঠানো মুস্তাহাব	৬৪৪
মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে খানার দাওয়াত দেয়া বিদ'আত	৬৪৫
মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া	৬৪৬
ইছালে সাওয়াবের সুন্নাতী পদ্ধতি	৬৪৬
ফরয ইবাদতের ইছালে সাওয়াব	৬৪৭
একটি ইবাদতের সাওয়াব কয়েকজনকে পৌছানো	৬৪৭
হাদীস দ্বারা ইছালে সাওয়াব প্রমাণিত	৬৪৭

অধ্যায়-২৩. শহীদের আহকাম

দুর্ঘটনায় নিহত এবং শরীরের বিচ্ছিন্ন অঙ্গের গোসল, কাফন এবং জানাযা সংক্রান্ত মাসাইল	৬৪৮
শহীদের আহকাম	৬৪৮
শহীদের প্রকার	৬৪৮
বিভিন্ন দুর্ঘটনায় (মৃত্যুবরণকারী) নিহতদের এবং শরীরের বিচ্ছিন্ন অঙ্গসমূহের, গোসল, কাফন ও জানাযার সালাতের মাসাইল	৬৫৪
গর্ভপাতের মাসাইল	৬৫৪
জানাযার সাথে সম্পৃক্ত বিবিধ মাসাইল	৬৬০
পরিশিষ্ট-১. নির্বাচিত মাসাইল নির্দেশিকা (তাহারাত)	৬৬৩
পরিশিষ্ট-২. নির্বাচিত মাসাইল নির্দেশিকা (সালাত)	৬৭৫
পরিশিষ্ট-৩. গ্রন্থপঞ্জি	৬৮৯

***

ফিক্হ ও ফকীহ

ইসলাম সর্বাঙ্গসুন্দর ও সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা। এতে মানুষের জীবন পরিচালনার সকল দিক ও বিভাগের বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সাহাবা ও ইমামগণের হাতে ঐ সকল বিধি-বিধান পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ঐসব বিধি-বিধান ও আইন-কানুন যে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে তাই ফিক্হশাস্ত্র।

ফিক্হ-এর আভিধানিক অর্থ

ফিক্হ-এর আভিধানিক অর্থ কোনো কিছু জানা বা বুঝা। এটা বাবে سَمِعَ থেকে মাছদার। فَقَاهَةٌ শব্দটি বাবে كَرُمَ হতে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা খায়রুদ্দীন রামলী বলেন, فِقْهٌ শব্দটি سَمِعَ থেকে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ 'সে বুঝে নিয়েছে', আর যদি كَرُمَ থেকে ব্যবহৃত হয় তাহলে এর অর্থ হলো অন্যের আগে নিজে বুঝে নিয়েছে। যদি كَرُمَ থেকে ব্যবহৃত হয় তবে এর অর্থ হবে ফিক্হ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা। ফিক্হ শব্দের আভিধানিক অর্থ খুলে ফেলা। পরবর্তীতে এটা কোনো বিষয় জানা বা তাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। –নেহায়া (খ-৩, পৃ-৪৩৭); লিছানুল আরব (খ-১৭, পৃ-৪১৮)

আল্লামা রশীদ রেজা তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন,

ذُكِرَ هٰذَا اللَّفْظُ فِىْ عِشْرِيْنَ مَوْضَعًا مِنَ الْقُرْاٰنِ تِسْعَةَ عَشَرَ مِنْهَا تَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْمُرَادَبِهٖ نَوْعٌ خَاصٌّ مِنْ دِقَّةِ الْفَهْمِ والتَّعَمُّقِ فِى الْعِلْمِ الَّذِىْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الاِنْتِفَاعُ بِهٖ

অর্থাৎ, আল কুরআনে ফিক্হ শব্দটি বিশ জায়গায় উল্লেখ রয়েছে। এর উনিশটিই সুতীক্ষ্ণ উপলব্ধি এবং গভীর ইলমের ফলপ্রসূ বিশেষ এক প্রকারের লব্ধ জ্ঞানের অর্থ বুঝিয়েছে।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানি বলেন,

اَلْفِقْهُ هُوَ التَّوَصُّلُ اِلٰى عِلْمِ غَيْبٍ بِعِلْمِ شَاهِدٍ فَهُوَ اَخَصُّ مِنَ الْعِلْمِ

অর্থাৎ, ফিক্হ হলো কোনো বিষয়ের বাহ্যিক জ্ঞানের মাধ্যমে তার অন্তর্নিহিত জ্ঞান লাভ করা। সন্দেহ নেই যে, ইলম একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ এবং ফিক্হ তার একটি বিশেষ ও বৈশিষ্ট্যময় অংশ। –আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (পৃ-৩৮৪)

সাইয়্যেদ আমীমুল এহসান বলেন,

اَلْفِقْهُ فِى اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ فَهْمِ غَرْضِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ كَلَامِهٖ

অর্থাৎ, আভিধানিক অর্থে ফিক্হ হলো বক্তার বক্তব্য থেকে তার কথার উদ্দেশ্য অনুধাবন করা। –আত তা'রীফাতুল ফিকহিয়্যাহ (পৃ-৪১৪)

আবুল ফযল জামাল উদ্দীন মিসরী বলেন,

اَلْفِقْهُ اَلْعِلْمُ بِالشَّئْ وَالْفَهْمُ لَهٗ وَغَلَبَ عَلٰى عِلْمِ الدِّيْنِ لِسِيَادَتِهٖ وَشَرَفِهٖ وَفَضْلِهٖ عَلٰى سَائِرِ اَنْوَاعِ الْعِلْمِ وَقَدْ جَعَلَهُ الْعُرْفُ خَاصًّا بِعِلْمِ الشَّرْعِيَّةِ

অর্থাৎ, ফিক্হ হলো কোনো কিছু জানা এবং উপলব্ধি করা, তবে ইলমে দীনের উপরই ফিক্হ শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হয়। কেননা, এ ইলম স্বীয় গুরুত্ব ও ফযীলতের ফলে অন্যান্য ইলমের

উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। ওলামায়ে ইসলামের প্রচলনে ফিক্হকে ইলমে শরী'আতের জন্য খাস করা হয়েছে। –লিসানুল আরব (খ-১৩শ, পৃ-৫২২); তারতীবু কামুসিল ফিকহী (খ-৩, পৃ-৫১৩); মো'জামু লোগাতিল ফুকাহা (পৃ-৩৪)

ফিক্হ-এর পারিভাষিক অর্থ

ফিক্হ-এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনায় বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন ভাষ্য-পদ্ধতি অনুসরণ করলেও দেখা যায়, সবাই প্রায় একই সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে আবুল কাসেম হোসাইন আর রাগিব বলেন,

اَلْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْاَحَكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

অর্থাৎ, শরী'আতের বিধানসমূহের ইলমের নামই ফিকহ। –আল মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন (পৃ-৩৮৪); নেহায়া গ্রন্থকার বলেন, "ইলমে শরী'আত ও তার শাখাগত জ্ঞানকে পরিভাষায় ফিক্হ বলা হয়। –নেহায়া (খ-৩য়, পৃ-২৩৭)

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, اَلْفِقْهُ مَعْقُوْلٌ مِنْ مَنْقُوْلٍ

অর্থাৎ, বর্ণিত ভাষ্যসমূহ তথা কুরআন ও হাদীস থেকে বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা উদ্ভাবিত জ্ঞানকে ফিক্হ বলে। এ সংজ্ঞা দ্বারা বুঝা যায়, শরী'আতের সকল জ্ঞানই ফিক্হের অন্তর্ভুক্ত। চাই তা আকাঈদ বিষয়ক হোক বা বাস্তব জীবন পরিচালনা বিষয়ক হোক।

মিফতাহুস সাআদাত গ্রন্থকার বলেন,

اَلْفِقْهُ عِلْمٌ بَاحِثٌ عَنِ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِسْتِنْبَاطِهَا مِنَ الْاَدِلَّةِ التَّفْصِيْلِيَّةِ

অর্থাৎ, বাস্তব জীবন ব্যবস্থায় শরী'আতের ঐ প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহের জ্ঞানকে ইলমে ফিক্হ বলে, যা ঐগুলোর বিস্তারিত দলীল প্রমাণাদি থেকে উদ্ভাবন করা হয়। মুসাল্লামুস সুবূত গ্রন্থেও প্রায় অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। –মো'জামু লুগাতিল ফুকাহা (পৃ-৩৪৮)

মুহাম্মদ আলাউদ্দীন হাসকাফী দুররুল মুখতারে বর্ণনা করেন,

اَلْفِقْهُ اَلْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ اَلْمُكْتَسَبُ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

অর্থাৎ, শরী'আতের বিস্তারিত দলীল-প্রমাণাদি হতে শরী'আতের শাখাগত আহকামের অর্জিত জ্ঞানকে ফিক্হ বলে। –দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার (খ-১ম, পৃ-৩৪); আততারীফাতুল ফিকহীয়্যাহ (পৃ-৪১৪)

ইমাম জায়েন ইবনে ইবরাহীম ইবনে নুজাইম তাঁর বিখ্যাত আল-আশবাহ ওয়ান্নাযাইর গ্রন্থে বলেন,

هُوَ الْوُقُوْفُ عَلٰى مَعَانِى نُصُوْصِ الشَّرْعِيَّةِ وَاشَارَاتِهَا وَدَلَالَاتِهَا وَمُضْمِرَاتِهَا وَمُقْتَضِيَاتِهَا وَالْفَقِيْهُ اِسْمٌ لِلْوَاقِفِ عَلَيْهَا

অর্থাৎ, কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি অর্থ অনুধাবন করা এবং তার ইশারা-ইঙ্গিত উপলব্ধি করা, অনুক্ত ও উহ্য বিষয়াদি অবহিত হওয়া এবং তার দাবি ও চাহিদানুসারে এতদুভয়ের উপর গভীর ব্যুৎপত্তি লাভই মূলত ইলমে ফিক্হ। আর এসব সম্পর্কে যিনি অবগত হন তিনিই ফকীহ।

অধ্যায় [১] ওযূর বর্ণনা

ওযূ ইবাদতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তাহারাত পদ্ধতি। বিশেষত সালাতের জন্য অপরিহার্য শর্ত। আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা কেবল ওযূর কথাই বলেননি; বরং বিস্তারিতভাবে এর কার্যপ্রণালীর বর্ণনা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا قُمۡتُمۡ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغۡسِلُوۡا وُجُوۡهَكُمۡ وَ اَيۡدِيَكُمۡ اِلَى الۡمَرَافِقِ وَ امۡسَحُوۡا بِرُءُوۡسِكُمۡ وَ اَرۡجُلَكُمۡ اِلَى الۡكَعۡبَيۡنِ ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন সালাতের ইচ্ছা করবে তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে, মাথা মাসেহ করবে এবং তোমাদের পদদ্বয় টাখনু পর্যন্ত ধৌত করবে।” [সূরা ৫; মায়িদা ৬]

সিহাহ সিত্তাসহ অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে ওযূর প্রতি বিশেষ তাকীদ প্রদান করার পাশাপাশি এর বহু ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং এর মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। তাহারাত বা পবিত্রতা দু'প্রকার, যথা- (১) ইবাদতের জন্য পবিত্রতা। (২) নাজাসাত থেকে পবিত্রতা।

ইবাদতের জন্য পবিত্রতা দু'ভাবে হতে পারে; পানি দ্বারা কিংবা মাটি দ্বারা। পানি দ্বারা যে পবিত্রতা অর্জন করা হয় তা দু'প্রকার, ওযূ এবং গোসল। এ অধ্যায়ে পনেরটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

পরিচ্ছেদ [১/১] ওযূর শর্ত

ইবাদত ও প্রত্যেক শরয়ী আহকামের জন্য শর্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শর্ত বাদ দিলে মৌলবস্তু পরিপূর্ণ হয় না। সুতরাং প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূর্ণ হলেই উদ্দিষ্ট বস্তু বা কাজ পরিপূর্ণতা লাভ করবে। ওযূর শর্তসমূহ দু'প্রকার- (১) ওযূ ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ, (২) ওযূ শুদ্ধ ও সঠিক হওয়ার শর্তসমূহ।

ওযূ ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহের বিবরণ

এ সব শর্ত ইবাদতের জন্য সক্ষম ব্যক্তির উপর ওযূ করাকে ওয়াজিব করে। যদি এ সকল শর্ত কারো মধ্যে পূর্ণ বা আংশিক পাওয়া না যায়, তাহলে ওযূ ওয়াজিব হবে না। এগুলো নিম্নরূপ:

১. জ্ঞান (বা সুস্থমস্তিষ্ক) সম্পন্ন হওয়া। সুতরাং কোনো পাগল, বেহুঁশ, মতিভ্রম ও স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত ব্যক্তির জন্য ওযূ ওয়াজিব হবে না।

২. মুসলিম হওয়া। অতএব কাফিরের জন্য ওযূ ওয়াজিব হবে না। কেননা, কাফিররা ইবাদতের নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়।

৩. বালেগ হওয়া। তাই অপ্রাপ্তবয়স্কদের উপর ওযূ ওয়াজিব নয়; ছেলে হোক, মেয়ে হোক বা নপুংসক হোক।

৪. পানি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া। যে ব্যক্তি পানি ব্যবহার করতে অক্ষম তার উপর ওযূ ওয়াজিব নয়; বরং সে তায়াম্মুম করে নেবে।

৫. সালাতের ওয়াক্ত হওয়া। ওযূ ব্যতীত সালাত আদায় করা জায়িয নেই। তাই ওয়াক্ত হলে ওযূ করে সালাত আদায় করতে হবে।

৬. হায়েয-নেফাসের রক্তস্রাব হতে মেয়েদের পবিত্র থাকা। এ দুটি জিনিস গোসলকে ফরয করে।

৭. সালাতের ওয়াক্ত সংকীর্ণ না হওয়া। সালাতের ওয়াক্ত এতটুকু থাকা যে, ঐ সময়ে ওযূ ও সালাত আদায় করা সম্ভব। যদি কারো এতটুকু সময় না থাকে তাহলে তার উপর ওযূ ওয়াজিব হবে না। যেমন– কোনো কাফির এমন সংকীর্ণ সময়ে ইসলাম কবুল করল যে, ওযূ এবং সালাত কোনোটাই আদায় করা সম্ভব নয় অথবা কোনো নাবালেগ যদি এমন সংকীর্ণ সময়ে বালেগ হয় তাহলে তাদের জন্য ওযূ ওয়াজিব হবে না।

৮. হদসে আসগর বা বায়ু নির্গমন হেতু ওযূ বিহীন অবস্থায় থাকা।

মাসআলা: কোনো নাবালেগ যদি বালেগ হওয়ার পূর্বক্ষণে ওযূ করে তাহলে তার ওযূ সঠিক হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। যেমন কেউ বালেগ হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে ওযূ করল, তারপর বালেগ হলো তাহলে তার ওযূ বহাল থাকবে এবং তার জন্য ঐ ওযূ দিয়ে সালাত পড়াও জায়িয। –দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার (খ-১, পৃ-৮০); মাসায়েলে ওযূ (পৃ-৫১); কিতাবুল ফিক্‌হ (খ-১, পৃ-৮০); ইলমুল ফিক্‌হ (খ-১, পৃ-৫৩)

ওযূ শুদ্ধ ও সঠিক হওয়ার শর্তসমূহ

১. পানি পবিত্র হওয়া। অপবিত্র পানি দিয়ে বা ফল নিংড়ানো বা অন্য কোনো উদ্ভিদ নিংড়ানো পানি দিয়ে ওযূ শুদ্ধ হবে না। এ সব ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করে নেবে।

২. ওযূর অঙ্গসমূহের সকল স্থানে পানি পৌঁছে দেয়া। ওযূর অঙ্গসমূহের কোনোটি যদি এক চুল পরিমাণ শুকনা থাকে তাহলে ওযূ হবে না।

৩. শরীরে এমন কোনো বস্তু না থাকা যার কারণে শরীরে পানি পৌঁছতে পারে না। যেমন ওযূর অঙ্গসমূহের উপর যদি চর্বি, মোম বা অন্য কোনো আবরণ থাকে তাহলে ওযূ শুদ্ধ হবে না।

৪. যে সকল অবস্থায় ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং যে সকল অবস্থা ওযূকে নষ্ট করে, ওযূ করার কালে ঐ সব অবস্থা না হওয়া। কিন্তু যদি ওযূ সম্পাদনকারী মা'যূর হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

মাসআলা: কোনো মহিলা যদি হায়েয অবস্থায় ওযূ করে, তারপর হায়েয থেকে পাক হয় তাহলে ঐ ওযূ গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, তা প্রথমেই শুদ্ধ ছিল না। বরং তার উপর গোসল ফরয হবে।

মাসআলা: কোনো জুনূবী (যার উপর বীর্যপাতজনিত গোসল ফরয হয়েছে) যদি ওযূ করে তাহলে তার ওযূ শুদ্ধ হবে না। কারণ তার উপর গোসল ফরয হয়েছে। তবে এতে ফরয গোসলের সুন্নাত আদায় হবে। তেমনিভাবে প্রস্রাব-পায়খানা করা অবস্থায় কেউ ওযূ করলে তার ওযূ হবে না। –মাসায়েলে ওযূ (পৃ-৫২); ইলমুল ফিক্‌হ (খ-১, পৃ-৫৩); কিতাবুল ফিক্‌হ (খ-১, পৃ-৮২); রাদ্দুল মুহতার (খ-১, পৃ-৮০-৮১)

প্রথম অধ্যায়

সালাত ফরয হওয়ার শর্ত

সালাত ফরয হওয়ার শর্ত মোট তিনটি।

১. মুসলিম হওয়া, ২. বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হওয়া ও ৩. জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।

(১) মুসলিম হওয়া

কেননা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সালাত, সাওমসহ অন্যান্য সকল শরয়ী নির্দেশ মুসলিমদেরকেই করা হয় এবং এগুলো মুসলিমের জন্যই প্রযোজ্য। -মারাকিউল ফালাহ (পৃ-৩৮)

১. কোনো কাফির যদি সালাতের ওয়াক্তে, জামা'আতের সহিত মুক্তাদি হিসেবে পূর্ণ সালাত আদায় করে তাহলে তাকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে এবং মুসলিমদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। –দুররুল মোখতার ও রাদ্দুল মোহতার (খ-১, পৃ-৩২৬)

২. কোনো কাফির যদি জামা'আতের সাথে মুক্তাদী হিসেবে সালাত শুরু করে তাকবীর বলার পর বা আংশিক আদায়ের পর সালাত ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে না। –রাদ্দুল মোহতার (খ-১, পৃ-৩২৭)

৩. কাফির যদি সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে সালাত পড়ে বা একাকি আযান-ইকামত ব্যতীত সালাত পড়ে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে গণ্য করা হবে না। –দুররুল মোখতার ও রাদ্দুল মোহতার (খ-১, পৃ-২৭৭)

৪. সালাতের ওয়াক্তে যদি কোনো কাফির আযান প্রদান করে বা কোনো কাফির মাসজিদে আযান দেয় বা তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করে বা যাকাত প্রদান করে তাহলে তাকে মুসলিম গণ্য করা হবে। –দুররুল মোখতার ও রাদ্দুল মোহতার (খ-১, পৃ-২২৭)

৫. কাফির যদি এমন কোনো ইবাদত করে যা পূর্ববর্তী উম্মত ও ধর্মসমূহে প্রচলিত ছিল সেসব ইবাদতের কারণে তাকে মুসলিম গণ্য করা হবে না। যেমনঃ একাকি সালাত পড়া, সাওম রাখা, অসম্পূর্ণ হজ্জ আদায় করা, দান করা ইত্যাদি। তবে যদি এগুলো ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী আদায় করে যেমন– জামা'আতে সালাত আদায় করে, মুসলিমদের সাথে পূর্ণ হজ্জ আদায় করে, মাসজিদে আযান দেয়, কুরআন তিলাওয়াত করে, তাহলে তাকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে। –মুহিত, রাদ্দুল মোহতার (খ-১, পৃ-৩২৮)

৬. কাফির যদি মুসলিমদের মতো হজ্জ আদায় করে তাহলে তাকে মুসলিম গণ্য করা হবে। তবে যদি সে তাসবীহসহ পাঠ করে এবং হজ্জের মানাসিক সমূহে উপস্থিত না হয় বা মানাসিকে উপস্থিত হয় কিন্তু তাসবীহ পাঠ না করে তাহলে তাকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে না। –রাদ্দুল মোহতার (খ-১, পৃ-৩২৮)

৭. কাফিরকে কুরআন শিখতে বা পড়তে দেখলে এজন্য তাকে মুসলিম বলা যাবে না এবং কাফিরকে কুরআন শিখতে বাঁধা দেয়া যাবে না। কেননা, কুরআন শিখে সে মুসলিমও হতে পারে। –রাদ্দুল মোহতার (খ-১, পৃ-৩২৮)

(২) বালেগ হওয়া

ইসলামী শরী'আত নাবালেগ বা অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য কোনো নির্দেশ প্রদান করেনি। চাই তা বদনী ইবাদত হোক বা মালী কোনো ইবাদত হোক। কেবল প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ইবাদত ফরয।

১. ছেলেদের বালেগ হওয়ার আলামত তিনটি।
ক. বীর্য বের হওয়া খ. স্বপ্নদোষ হওয়া গ. পনের বছর বয়স হওয়া।

২. মেয়ে সন্তান বালেগা হওয়ার আলামত পাঁচটি।
ক. স্বপ্নদোষ হওয়া, খ. বীর্য বের হওয়া গ. হায়েয হওয়া ঘ. গর্ভবতী হওয়া ঙ. পনের বছর বয়স হওয়া। –নোতাফ (পৃ-৭৪)

৩. সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তাকে সালাতের জন্য আদেশ দেবে এবং দশ বছর বয়স হওয়ার পর সালাত আদায় না করলে তাকে মারবে। যাতে করে তার সালাতের অভ্যাস গড়ে উঠে কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَوٰةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوْا هُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ»

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের আদেশ দাও এবং তাদেরকে সালাতের জন্য দশ বছর বয়সে মার।" – আবূ দাউদ: ৪৯৫, ৪৬৬; তিরযিমী: ৪০৭; দারেমী: ১৪৩১; দুররুল মোখতার ও রাদ্দুল মোহতার (খ-১, পৃ-৩২৬); মারাকিউল ফালাহ (পৃ-৩৮); মাসায়েলে সালাত (পৃ-২৩১); তাহতাভী (পৃ-৩৮); বেহেশতী জেওর (খ-১, পৃ-৮৯)

৪. অভিভাবকগণ হাত দ্বারা প্রহার করবেন। কোনো লাঠি বা বেত বা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করবেন না। কেননা, লাঠি, বেত ইত্যাদি বালেগ অন্যায়কারী ব্যক্তির শাস্তি স্বরূপ শরী'আত ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। অভিভাবক নাবালেগকে মারতে গিয়ে তিনের বেশি আঘাত করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরদাস নামক এক শিক্ষককে বলেছেন,

«اِيَّاكَ اَنْ تَضْرِبَ فَوْقَ اَلثَّلَاثِ فَاِنَّكَ اِذَاضَرَبْتَ فَوْقَ اَلثَّلَاثِ اِقْتَصَّ اَللّٰهُ مِنْكَ»

তুমি তিনবারের বেশি প্রহার করা হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, তুমি যদি তিনবারের বেশি প্রহার কর আল্লাহ তাআলা তোমার কাছ থেকে এজন্য কেসাস নেবেন। জাওয়াহেরুল একলীল (খ-১, পৃ-২৯৬); রাদ্দূল মোহতার ও দুররুল মোখতার (খ-১, পৃ-৩২৬); মারাকিউল ফালাহ ও তাহতাভী (পৃ-৩৮)

৫. নাবালেগ ছেলে মেয়ের বয়স দশ (১০) বছর হলে তাদের পরস্পরে বিছানা আলাদ করে দেয়া ওয়াজিব। এমন কি তাদের বিছানা পিতামাতা থেকেও আলাদা করে দেয়া ওয়াজিব। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِيْ اَلْمَضَاجِعِ وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ»

"তোমাদের ছেলে মেয়েদের বয়স দশ হলে তাদের শোয়ার স্থান পৃথক করে দাও।" আবূ দাউদ: ৪৯৫; তিরমিযী: ৪০৭; তাহতাভী (পৃ-৩৯)